উদ্বেগজনকভাবে বাড়ছে শিক্ষার্থীদের আত্মহনন

এম এইচ রবিন
১৬ জুলাই ২০২৫, ১২:০০ এএম

দেশে শিক্ষার্থীদের মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতা দিনকে দিন বাড়ছে। বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে এই প্রবণতা উদ্বেগজনক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এদের মধ্যে অনেকে ‘আমার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়’- এমন চিরকুট (সুইসাইড নোট) লিখে আত্মহননের পথ বেছে নিচ্ছে। সর্বশেষ গত সোমবার সকালে আত্মহত্যা করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) নৃবিজ্ঞান বিভাগের চতুর্থ বর্ষের শিক্ষার্থী সঞ্জু বারাইক। একই মাসে ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থী তারেক ওয়াদুদ নাহিদ, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের জান্নাতুল ফেরদৌসি টুম্পা, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের আসাদুজ্জামান ধ্রুব, ঢাবি চারুকলার শিক্ষার্থী শাকিল আহমেদ এবং ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থী শিহাবুল ইসলাম আত্মহত্যা করেন। অবস্থা

এমন হয়েছে, যেন আত্মত্যার মিছিল চলছে দেশের শিক্ষাঙ্গনে।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, প্রতিটি আত্মহত্যা কেবল ব্যক্তিগত ট্র্যাজেডি নয়; এটি একটি পরিবারের স্বপ্নভঙ্গ, দেশের মেধা ও মানবসম্পদের অপচয় এবং আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা ও সমাজ কাঠামোর নীরব ব্যর্থতার প্রতিফলন। সম্প্রতি ঘটে যাওয়া একের পর এক আত্মহত্যার ঘটনা যেন চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে, সংকট কতটা গভীর।

বেসরকারি সংস্থা আঁচল ফাউন্ডেশনের তথ্যমতে, ২০২৩ সালে ৫১৩ জন শিক্ষার্থী আত্মহত্যা করেছে। ২০২২ সালে এই সংখ্যা ছিল ৫৩২ জন। যদিও ২০২৪ সালে এটি কমে দাঁড়ায় ৩১০-এ, বিশেষজ্ঞদের মতে, মিডিয়া কাভারেজ কমে যাওয়ায় প্রকৃত চিত্র আড়ালেই থেকে গেছে। আর ২০২১ সালে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের ১০১ জন শিক্ষার্থী আত্মহত্যা করেন, যাদের মধ্যে প্রায় ৬১% পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের।

আত্মহননে নানা কারণ : আত্মহনন বেড়ে যাওয়ার পেছনে একাধিক জটিল ও গভীর কারণ কাজ করছে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। আমেরিকান সাইকিয়াট্রিক অ্যাসোসিয়েশনের ফেলো ও মানসিক স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ ডা. ওবায়দুর রহমান চৌধুরী বলেন, শিক্ষার্থীদের আত্মহত্যার পেছনে প্রধানত পাঁচটি কারণ কাজ করে- একাডেমিক চাপ, পারিবারিক ও সামাজিক প্রত্যাশা, সম্পর্কজনিত সংকট, ক্যারিয়ার অনিশ্চয়তা এবং মানসিক স্বাস্থ্যসেবার অপ্রতুলতা। তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির পর শিক্ষার্থীরা প্রবেশ করে এক অমানবিক প্রতিযোগিতায়, যেখানে ভালো সিজিপিএ, ভালো চাকরি আর সফলতা অর্জনের চাপ তাদের নিঃশেষ করে ফেলে। এই দৌড়ে পিছিয়ে পড়া মানেই আত্মবিশ্বাস হারানো ও নিজেকে ব্যর্থ ভাবা। পারিবারিক প্রত্যাশাও অনেক সময় শিক্ষার্থীদের ওপর অসহনীয় হয়ে ওঠে। আবার প্রেম বা সম্পর্কের জটিলতাও তাদের মানসিক ভারসাম্য নষ্ট করে। এ ছাড়া বিশেষ করে স্নাতকের শেষ বর্ষে ক্যারিয়ার নিয়ে যে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়, তা অনেককে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করে।

প্রতিরোধে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের করণীয় : আত্মহননে মানসিক স্বাস্থ্যের প্রতি অবহেলাই বড় দুর্বলতা হিসেবে কাজ করছে বলে মনে করেন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সাইকিয়াট্রি ফেলো ডা. শহিদুল্লাহ শিশির। তিনি বলেন, আমাদের শিক্ষাঙ্গনে এখনও মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে কথা বলাটা লজ্জার বিষয় বলে বিবেচিত হয়। ফলে অনেক শিক্ষার্থী সংকট থাকা সত্ত্বেও কাউকে কিছু বলতে পারে না। সমস্যা সমাধানে প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি কার্যকর মানসিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র গড়ে তোলা জরুরি। সেখানে থাকতে হবে প্রশিক্ষিত মনোরোগ চিকিৎসক ও কাউন্সেলর। শিক্ষকদের বিশেষ প্রশিক্ষণ দিতে হবে যেন তারা সংকটে থাকা শিক্ষার্থীদের শনাক্ত করে সহানুভূতির সঙ্গে পাশে দাঁড়াতে পারেন।

সমাজ ও রাষ্ট্রের সম্মিলিত দায় : সমাজবিজ্ঞানী অধ্যাপক খান আসাদ-উজ জামান চৌধুরী বলেন, শুধু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ওপর দায় চাপালেই হবে না। পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রকেও এগিয়ে আসতে হবে। মানসিক স্বাস্থ্যসেবাকে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার অংশ করতে হবে এবং বাজেট বরাদ্দ বাড়াতে হবে। সন্তানকে ভালো রেজাল্টের চাপে না ফেলে তার আবেগ-অনুভূতিকে গুরুত্ব দিতে হবে। তিনি বলেন, আত্মহত্যা কোনো সমাধান নয়, এটি এক চরম যন্ত্রণার বহিঃপ্রকাশ। কখনও কখনও একটি সহানুভূতির বাক্য, একটি সহায়তার হাতই কাউকে বাঁচিয়ে দিতে পারে। এখনই সময়, সমাজ, পরিবার ও রাষ্ট্র মিলে শিক্ষাঙ্গন থেকে এই মৃত্যু-ছায়া সরিয়ে সম্ভাবনাগুলোকে আলোকিত করার।